পরিবেশের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

— সুভাজিত বিশ্বাস

পরিবেশ কথার অর্থ হচ্ছে আমাদের পারিপার্শ্ব, যার মধ্যে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় উপাদানই বর্তমান। মানুষের কাজ কর্মের উপর পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সব কাজ পরিবেশদ্বারা নির্ধারিত হয় ভাবলে ভুল হবে। পরিবেশের প্রভাবও মানুষের জীবনধারার উপর প্রবলভাবে পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে আঘাত বা ক্ষতির না করে আমরা প্রাচীন যুগেও কোনও মানবসমাজের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করতে পারি না। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি সাধারণভাবে গড়ে উঠেছিল হ্রদ বা নদীর পাড়ে, পাহাড়ী এলাকায় মালভূমিতে, অরণ্য অঞ্চলে যেখানে মানুষজন তাদের জীবিকার প্রয়োজনে পাথর অথবা হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করতে পারতো। এই সব হাতিয়ার শিকার, মাটি খোঁড়াখুড়ি করা, যুদ্ধবিগ্রহের কাজেও ব্যবহৃত হত। এ কথা বলা যায় জীবন ধারণের জন্য প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেছিল। সেই সূত্রে প্রকৃতির সাথে তার এবং তার পোষিত পশু-শ্রেণীর পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক তৈরী হয়।

পরিবেশ, পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ দর্শন— এসব কথা যে আসলে চালু ছিল না, কিন্তু কথাগুলোর যে তাৎপর্য, সেই তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা ছিল যথেষ্ট। আদি বৈদিক সাহিত্যে দেবতাকে প্রকৃতির প্রকাশ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। প্রকৃতিকে বলা হয়েছে জীবনের উৎস। প্রাচীন ভারতবর্ষে নদীগুলিকে দৈব বলে উক্ত করা হত। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীকে দেবী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈদিক যুগের পরবর্তীতে মাতৃদেবী হিসাবে আবির্ভূতা হন গঙ্গা। এখনও সেই পরম্পরা সমানে চলছে। যেহেতু মৃত্তিকা এবং জল উভয়ই উদ্ভিদ এবং পশুপাখিকে পালন করে তাই তাদের মাতৃরূপে দেখা হয়। ঋগ্বেদের সংহিতায় প্রকৃতির আনুকূল্যে প্রার্থনা করা হয়েছে। মানুষ কামনা করেছে — বায়ু মধুময় হোক, নদীগুলো মধুময় হোক, ঔষধি মধুময় হোক, দিন-রাত, আকাশ-সূর্য, গাছ-পাতা, পশু-পাখি, ধূলিকণা সবই মধুময় হোক।

Scanned with CamScanner

বৈদিক যুগে কৃষির বিস্তার বনাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। 'অগ্নি বৈশ্বানরের' — সাহায্যে জঙ্গল পুড়িয়ে জমি হাসিল করতে গিয়ে 'ইন্দ্র - বিন্দু' - পরিবেশের উপর চাপ তৈরি করেছিলেন। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রনির্মাণের সাথে বনাঞ্চলে রাজকীয় অন্নপ্রাশন একটি আবশ্যক কাজ বলে মনে করা হত। কিন্তু রাজন্যবর্গের অতিরিক্ত মৃগয়া বনাঞ্চলের জীবজন্তুদের ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কায় অতি মৃগয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল, তাকে নিন্দা করে বলা হত 'ব্যসন' - বলে। বনবাসী বা আরণ্যক জাতিউপজাতির বংশপরম্পরায় এই নির্বিশেষে মেনে চলত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকান্ডে বলা হয়েছে যে, কেবল পাঁচটি পঞ্চনখা প্রাণী 'ভক্ষ্য' বাকি সব 'অভক্ষ্য'। স্বীকৃত পাঁচটি পঞ্চনখা প্রাণী — সজারু, গন্ডার, গোসাপ, খরগোশ, কচ্ছপ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী বধ করা যাবে না। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে শিকারের উপর কয়েকটি আশ্চর্যমান্য নির্বিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন — ① কোন ধন জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হিংস্র অথবা অহিংস্র প্রাণী বধ করা বর্জনীয়। ② লোকালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কেবল হিংস্রপ্রাণী শিকার যোগ্য ③ যে সব বনাঞ্চলে শক্তিশালী পশুর বাস, সেখানকার গাছপালা কাটা অপরাধ ইত্যাদি।

রামায়ন এবং মহাভারত — এই দুটি কাব্যেই প্রকৃতি ও মানুষকে একই সত্তার শরিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালে সমাজের ধারনা ছিল গাছপালা জীবন্ত — তারা মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতই। বৈদিক সাহিত্যে 'বৃক্ষচৈতন্যের' উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি অন্যতম শাখা ছিল বৃক্ষায়ুর্বেদ। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে — গাছপালার স্পর্শানুভূতি আছে, তাই উষ্ণস্পর্শে গাছের পাতা, বাকল ও ফল শুকিয়ে যায়। ঝড়-বজ্রপাতে তারা আহত হয়, সর্পাঘাতে তারা আতঙ্কিত হয় অর্থাৎ গাছেরা শুনতে পায়। আসলে বৈদিক যুগে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়নি। রামায়ন - মহাভারতের যুগেও এই পরম্পরা বজায় ছিল। রামায়নে বলা হয়েছে বিশ্বামিত্র মুনির

যেন সত্যবতীই আসলে কৌশিকী নদী। সুচরিত্রের কারণে তিনি পবিত্র রূপ পেয়েছেন।

মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক যে কতটা যে নিবিড়, তা প্রাচীন সাহিত্যে বারেবারেই আলোচিত হয়েছে। নগর বিকাশের সঙ্গেও প্রকৃতির ঐতিহ্য এই ঘনিষ্ঠতার গুরুত্ব কখনই কমেনি। রামায়ণ-মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর জীবনের বেশী সময়টাই বনে কাটিয়েছে এবং কখনও বনবাসকে কষ্টদায়ক মনে হয়নি। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে রাম বনকেই অযোধ্য নগরীর মত মনে করছেন।

প্রাচীন কাল থেকেই অনেক বৃক্ষ যেমন নিম, অশ্বত্থ, শমী, বট, তুলসী প্রভৃতি কে পবিত্র হিসাবে মান্য করা হত। এই সবগাছকে মূল্য দেওয়া হত তাদের ঔষধি গুনাবলীর জন্য। সেইজন্য পূজো দিয়ে তাদের রক্ষা করা হত। এই রীতি এখনও আছে বড়ো বড়ো যজ্ঞের পর, এমনকি ছোটখাটো পূজোর পর পুরোহিতরা ও সাধারণ মানুষ নানা বৃক্ষ ও গাছপালার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করতেন।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও পরিবেশ সম্পর্কে এদের ধারণার চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। জৈন দর্শনে বৃক্ষকে জীবপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। জৈন দর্শনের কল্পবৃক্ষের ধারণা বৌদ্ধ দর্শনেও আছে। বৌদ্ধ সূত্রে বলা হয়েছে যে, বৃক্ষ ও জল এই দুইয়ের উপাসনার মধ্য দিয়ে মগধের মানবগোষ্ঠী সাফল্য লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মেও বৃক্ষপূজার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আরও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রাচীন সাহিত্যেই গবাদি পশুহত্যাকে নিন্দা করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ সুত্তনিপাত নামক পালি সাহিত্যগ্রন্থে গরুকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গবাদি পশুরা উদ্ভিদের ফলনে সাহায্য করে, জনজীবনকে খাদ্য ও শক্তি যোগায়। পশুর অপহরণে হত্যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, তাই তিনি গোহত্যা নিবারণ করতে বলেছিলেন। পশুবলি রোধ করে বৌদ্ধধর্ম জীবজন্তুদের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে কাজ করেছিল এবং ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও বেশি

Scanned with CamScanner

সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

গুপ্তযুগে জমির উপর ব্যক্তিসমূহের সামন্ত অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার সময় দেবতার সম্পদের ধারনার বিকাশ ঘটেছিল। আসলে দেবতার অজুহাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করবার উপজাতীয় পদ্ধতিরই এটা ছিল উচ্চবর্গীয় সংস্করণ। ভারতের বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৃক্ষপূজার প্রচলন ছিল তারই উচ্চবর্গীয় সংস্করণ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল 'পর্জন্যপূজা', 'নদীপূজা' বা 'স্মৃতিপূজার' ধরন। এই কারনে কৃষির স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও বহু বনাঞ্চল বনবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব তেমনভাবে ঘটেনি।

প্রাচীন ভারতের মানুষ যে তার পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন তার পরিচয় প্রায় সব ধরনের সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে আছে। শুধু ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বিভিন্ন লেখকদের লেখনীতে সেই পরিচয় সবসময়ই পাওয়া গেছে। যেমন, কালিদাস ও অন্যান্য তাঁদের কাব্য-নাটকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে শুধু জীবন নাট্যের পশ্চাদপট হিসাবে দেখেননি, দেখেছিলেন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। প্রাচীনভারতের বনবাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম, যাদুবিশ্বাস, দেবতার উদ্দেশ্যে বনকে উৎসর্গ করা, উর্বরতা তত্ত্বের প্রয়োগে বৃক্ষপূজা বা শিলা পূজো — এ সবই মানুষ ও পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই পরিচায়ক। এ আসলে ছিল প্রকৃতি সংরক্ষণের একটি যৌথ প্রচেষ্টা, ইরফান হাবিব যাকে বলেছেন — 'corporate body for collective action.', প্রকৃতিকে ভারতবর্ষের মানুষ কখনই প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখেনি, দেখেছিল আত্মপক্ষ হিসাবে — এখানেই প্রাচীন ভারতের পরিবেশদর্শন অনন্য।

— o —

Scanned with CamScanner